তৃতীয় অধ্যায়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ১৯২২ সালে অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরের ষোলশহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭১ সালে ফ্রান্সের প্যারী শহরে । ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর এই ৪৯ বছরের আয়ুষ্কালের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই কাটিয়েছেন স্বদেশে । তাঁর সমগ্র শৈশব এবং ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত যৌবনকালের সমস্তটাই কেটেছে বাংলায় । তিনি পড়াশোনাও করেছেন স্বদেশে । কিন্তু তবুও তাঁর লেখায় বারে বারেই এসেছে প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাবের অভিযোগ । কারণ তাঁর জীবনের শেষ ২১ বছরের প্রায় সমস্তটাই কর্মসূত্রে কেটেছে প্রবাসে । তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্প, এবং উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন প্রবাস জীবনেই । তাই খুব সহজেই তাঁর রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাবের অভিযোগ আনা হয়েছে । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ নিজেও এই অভিযোগের কথা জানতেন । তাই ১৯৬৯ সালে তিনি বন্ধু শওকত ওসমানকে লেখা এক পত্রে এই অভিযোগের বিরূদ্ধে মর্মাহত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়ো লেখেন--

''আমি বিদেশে ব'লে সবাই আকারে একটা খোঁটা না দিয়ে পারেন না । উনি [আবুল ফজল] বলেছেন দশ-বারো বছরে দেশে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে যার খবর আমি রাখি না । শুনে বড় খুশী হলাম, কারণ দেশের পরিবর্তন হয়েছে তা সুখবর বৈকি । তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে তা জানতে পারলে জ্ঞান বৃদ্ধি হতো, লেখাও সমসাময়িক হতো। তিনি আরও লিখেছেন মুহাম্মদ মুস্তফার মতো লোকেরা আত্মহত্যা করে না । এ কথাও নিতান্ত খাঁটি । তবে সেই জন্যেই তো আমার মুহাম্মদ মুস্তফা আত্মহত্যা করেছে । দরিদ্র গ্রাম্য শিক্ষকও ও-সব ভাবে না, করে না, যা 'চাঁদের অমাবস্যা'র যুবক শিক্ষকটি ভেবেছে বা করেছে । আমার ইচ্ছা সাংবাদিক কাগজের রিপোর্টারের উর্দ্ধে ওঠা । কিন্তু তোমরা যেন চাও সাহিত্যিক রিপোর্টার হয়েই থাকুক । সেটি হবে না । তাহলে কষ্ট ক'রে লেখার প্রয়োজন কী? মনের কোণে লুকানো আশা বা স্বপ্নের (সেসবের দাম যাই হোক) কথা কিছু প্রকাশ না করলে চলে কি ক'রে ? .....একটা কথা । বিদেশে থাকলেও দেশান্তর ঘটে নি : মানে ইমিগ্রেন্ট-এর দলে ঢুকি নি । দু'টো আলাদা জিনিস, সেটা কী ক'রে বোঝাই ।''[১]

স্বদেশের প্রতি ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই টানের কথা জানাতে গিয়ে আলী আহসান এক স্মৃতিচারণে বলেছেন--

''ওয়ালীউল্লাহ্‌ বলেছিলেন, ''আমি কিন্তু বিদেশে থেকেও মানসলোকে দেশের অন্তরেই বাস করি । বরঞ্চ বলবো, যতই দিন যাচ্ছে ততই বেশি ক'রে দেশের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে চাচ্ছি । এই চেষ্টা সর্বক্ষণ আমার মধ্যে রয়েছে । বোধহয় আমার গ্রামের দিক্‌বলয় আমার কাছে হারিয়ে যাবে না ।''[২]

সম্ভবত তাঁর সম্পর্কে এই অভিযোগের আরো কারণ জীবনাচরণে তিনি ছিলেন ইংরেজ আভিজাত্যের অনুসারী । তাছাড়া তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ যেমন- 'দুইতীর' নামক গ্রন্থের গল্পগুলো তিনি প্রথমে ইংরেজিতে লিখে পরে বাংলায় অনুবাদ করেন । গল্পগুলো প্রকাশিত হয় বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক 'স্টেট্‌সম্যান'-এ । তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' এবং 'চাঁদের অমাবস্যা'রও যে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন তা আমরা জানতে পারি সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর সঙ্গে শ্রীমতি অ্যান-মারি তিবো (ওয়ালীউল্লাহ্‌) -র সাক্ষাৎকার থেকে -

''অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌র শুধু পত্নী নন, তাঁর আর একটি পরিচয়, তিনি লালসালু-র ফরাসি অনুবাদক ।.....

লালসালু-র ফরাসি অনুবাদ প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৩-তে, লন্ডন থেকে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের কয়েক বছর আগে । অ্যান-মারি অবশ্য বললেন, ফরাসি অনুবাদটি ১৯৬৪-তে বেরোয় । (হতে পারে আখ্যাপত্রে ১৯৬৩ থাকলেও '৬৪-র শুরুতে প্রকাশিত হয়।) তিনি বাংলা জানেন না, কি করে বাংলা উপন্যাসটির অনুবাদ করলেন-এ প্রশ্নের উত্তরে অ্যান -মারি বললেন : আমি ইংরেজি অনুবাদ থেকেই ফরাসিতে অনুবাদ করি মূল বাংলা থেকে নয়।

ইংরেজি অনুবাদ পেলেন কোথায় - এ প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন : ট্রি উইদাউট রুটস্‌ বেরোবার অনেক আগেই ওয়ালীউল্লাহ্‌ নিজে লালসালু-র একটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন । সেই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি থেকে আমি ফরাসিতে অনুবাদ করি । বস্তুত ইংরেজি অনুবাদটিও ওয়ালীউল্লাহ্‌রই করা । যদিও তাতে নাম আছে চারজনের । এই চারজনের মধ্যে যে নামটি কায়সার সাঈদ সেটি ওয়ালীউল্লাহ্‌র নিজেরই ছদ্মনাম । দ্বিতীয় অ্যান-মারি তিবো আমি । তৃতীয় ব্যক্তি জেফ্রি গিবিয়ান লালাসালু-র প্রথম অনুবাদক He is the first translator of Lalshalu,but his translation was not accepted by Wali. চতুর্থ ব্যক্তি-

মালিক খৈয়াম-ইউনেস্কোর একজন কর্মকর্তা । অনুবাদকর্মে তিনজন কমবেশি জড়িত থাকলেও ওয়ালীউল্লাহ্ই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন ।.....

ওয়ালীউল্লাহ্ নিজেই চাঁদের অমাবস্যা-র ইংরেজি অনুবাদ করে গিয়েছেন । প্রাথমিকভাবে নাম দিয়েছেন No Amaranth. নামটি যে তার খুব পছন্দ তাও নয় ।''[৩]

ফিলিপাইনে এক রেস্তোরায় ফরাসি অহংকারের তিরস্কারে আহত হয়ে লেখেন *How does one cook beans : An Asian Adventure in France,* পারীবাসী বাঙালি শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের জন্য লেখেন *Death Upstream,* সবশেষে *The Ugly Asian* নামে তিনশোর-ও অধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত এক রাজনৈতিক উপন্যাস লেখেন, সেও ইংরেজি ভাষায় । সর্বোপরি ব্যক্তিগত পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তাঁর ইংরেজি ভাষার ব্যবহার সকলকে তাঁকে ভুল বুঝতে সাহায্য করেছে ।

ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে আনা এই অভিযোগ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই বন্ধু শওকত ওসমানকে অনুরোধ করেন-*''এমন লোক জানো যে বেশ বিদগ্ধমানুষ কিন্তু জানে না আমি বিদেশে থাকি ? তেমন লোকের মত শুনতে ইচ্ছা হয় ।''*[৪]

তবে তাঁর সাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাবের অভিযোগ কি একেবারেই ভিত্তিহীন না এর মধ্যে কিছুটা হলেও সত্যতা রয়েছে ? সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যে প্রতীচ্যের বহু সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে । হতে পারে তা দর্শনগত বিচারে জাঁ পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ অথবা প্রকরণগত বিচারে জেমস জয়েস এর চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রভাব । কারণ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন একজন উদার পাঠক । তাঁর পড়াশুনার কোন সীমাব্ধতা ছিল না । তাঁর পড়াশুনার পরিধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্র স্ত্রী শ্রীমতি অ্যান-মারী-ওয়ালীউল্লাহ্ বলেছেন-

''ও ছিল এক সর্বভুক পাঠক; ওর পড়ার কাজটা বেশির ভাগ ছাত্রাবস্থাতেই হয়েছে। তার ঢাকার বন্ধুবান্ধব সৈয়দ নুরুদ্দিন, সানাউল হক, নাজমুল করিম, শওকত ওসমান, মুনীর চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করত । তার পড়াশোনার পরিধি খুবই বিস্তৃত ছিল। তলস্তয়, গোর্কি, পুশকিন, দস্তয়েভস্কি-এসব মহান রুশ লেখকের বই তার পড়া ছিল । মার্কস, এঙ্গেলস, টয়েনবি, কাসিরের, কাফকা, লোরকা প্রমুখ লেখকদের লেখাও তার ভালোমত পড়া ছিল । ফরাসি লেখকদের মধ্যে স্তাঁধাল, ভলতের, রুশো, দিদেরো প্রমুখ তো বটেই, সার্ত্রে, কামু, মালরো, স্যাঁত এক্সুপেরি, পল এলুয়ার প্রমুখের লেখাও তার ভালো করে পড়া ছিল ।''[৫]

প্রাশ্চাত্যের এত সাহিত্য যার নখদর্পনে তাঁর সাহিত্যে কম-বেশি বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব পড়াটাই খুব স্বাভাবিক ।তাই প্রতীচ্যের কোন কোন লেখকের কোন কোন প্রভাব সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কথাসাহিত্যে কোথায়, কীভাবে পড়েছে বা আদৌ পড়েছে কি না তা আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করব ।

সাধারণত ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে যেসব প্রতীচ্যের লেখকের প্রভাবের কথা বলা হয়ে থাকে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাঁ পল সার্ত্র, আলবেয়ার কামু, দস্তভয়েস্কি, যোসেফ কনরাড, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ প্রমুখ । যে কজন পাশ্চাত্য লেখকের প্রভাব ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় রয়েছে বলে মনে করা হয় তাঁদের মধ্যে চেক বংশোদ্ভূদ জার্মান ঔপন্যাসিক ফ্রান্স কাফকার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি রয়েছে বলে সমালোচকগন দাবি করেন । তবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে ফ্রান্স কাফকার প্রভাব আলোচনার পূর্বে আমরা একবার দেখে নেব বিশ্ববিখ্যাত এই লেখক, দার্শনিকের জীবন ও সাহিত্যকে ।

ঊনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে ফ্রান্স কাফকা ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক । তাঁর লেখার স্বকীয়তাই তাঁর মূল বৈশিষ্ট্য । কাফকা ১৮৮৩ সালের ৩রা জুলাই ফ্রান্সের প্রাহাতে এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম হারমেন কাফকা । যিনি ছিলেন এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী । কিন্তু কাফকা বরাবরই পিতার হোসিয়ারী ব্যবসার স্বচ্ছলতার চেয়ে, লোয়ী বংশোদ্ধভূত পন্ডিত, দার্শনিক মাতৃকুলের পরিচয় দিতেই অধিক গর্ববোধ করতেন । তাঁর এমন এক সময়ে জন্ম যখন ইহুদীদের নিজস্ব কোন ভূমি ছিল না । সে সময় ‘চেকোশ্লোভিয়া’ বলে কোন দেশ ছিল না । আবার বোহেমিয়া আর স্লোভাকিয়া ছিল অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অধীন । ইহুদীদের সেখানে খুব একটা সম্মান ছিল না । ফলে কাফকাকে বরাবরই একটা আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগতে হয়েছে । তাঁর আত্মপ্রকাশের নিজস্ব কোন ভাষা ছিল না । কারণ, যেহেতু তিনি এক ইহুদী পরিবারের সন্তান তাই স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চয়ই তাঁর পারিবারিক ও নিকট স্বামাজিক গন্ডীতে য়িডিশ ভাষাই চলত। অথচ পড়াশুনার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন শাসক সম্প্রদায়ের ভাষা জার্মান । তাই আত্বপ্রকাশের ভাষা নির্বাচনের দ্বন্দ্ব, আত্ম পরিচয়ের সংকট তাঁর মধ্যে বরাবরই কাজ করেছে। যাই হোক তিনি পড়াশুনা শুরু করেন ‘জার্মান ন্যাশনাল’, ‘সিভিক এলিমেন্টারি স্কুল, এবং ‘জার্মান ন্যাশনাল হিউম্যানিস্টিক জিমনেশিয়াম’-এ । ১৯০১ সালে তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছা

পূরণের জন্যে ‘ফার্ডিনান্দ কার্লস ইউনিভার্সিটিতে ল’ পড়তে শুরু করেন এবং ১৯০৬ সালে ‘ডক্টর অফ ল’ সম্মানে ভূষিত হন । কাফকার জীবনে তাঁর পিতা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন । সহজ , সরল, ভীতু স্বভাবের কাফকা ব্যক্তি জীবনে ‘পিতার শক্তিশালী বলয়’ অতিক্রম করতে পারেননি । তাঁর শৈশব কেটেছে অত্যন্ত সংকটের মধ্য দিয়ে । ১৯০২ সালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় বন্ধু ম্যাক্স ব্রডের সঙ্গে । কাফকার জীবনে এই ব্রডের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ এই ব্রডই কাফকার সাহিত্যের সঙ্গে বিশ্বকে পরিচয় করায় । কাফকা তাঁকে বলেছিলেন তাঁর সমস্ত পান্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলতে । কিন্তু ব্রড তা না করে পান্ডুলিপিগুলো প্রকাশকের কাছে দিয়েছেন । পড়াশুনা শেষ করার পর কাফকা ১৯০৭ সালে এক ল’ অফিসে ক্লার্কের চাকরি নেন । ১৯১২ সালে বন্ধু ম্যাক্স ব্রডের গৃহে পরিচয় হয় ফেলিস বের নামে এক তরুণীর সঙ্গে । পরে যে পরিচয় পণয়ের সম্পর্কে পরিণত হয় এবং তাদের মধ্যে বাগদানও হয় । যদিও ফেলিসের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে তাঁর জীবনে ছিল আরও অনেক নারী। এছাড়া নিয়মিত বারবনিতা গৃহে যাতায়াত ছিল তাঁর । এই ফেলিস বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল দীর্ঘ পাঁচ বছর । ফেলিসের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীনই কাফকা লেখেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘দি ট্রায়াল’এবং ‘ইন দ্য পেনাল কলোনি’ । ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় কাফকার ‘আমেরিকা’ গ্রন্থটি । পরবর্তীতে ১৯১৫-১৯১৬ সাল পর্যন্ত কাফকা কোন লেখালেখি করেননি । ১৯১৭ সালে তিনি পুনরায় তাঁর লেখালেখির জগতে ফিরে যান । কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই তাঁর যক্ষা ধরা পড়ে । ১৯১৯ সালে তিনি এক যক্ষা নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি হন । ধীরে ধীরে এই যক্ষাই ১৯২৪ সালে তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয় ।

এতো গেল কাফকার বাহ্যিক জীবন । তাঁর অন্তর্জীবন ছিল আরও জটিল । তাঁর জন্ম হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন একটা সাম্রাজ্য আষ্টেপৃষ্টে নিয়ম কানুনের সেন্সরশিপের শেকলে বাঁধা, অথচ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে সর্বত্র । যার সব দিকে অবক্ষয়, দারিদ্র, আর অপশাসন এমনই লাগামছাড়াভাবে জীবনের সঙ্গে লাগানো যে একটা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন কিন্তু সে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত আসে যখন কাফকার বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে । ফলে তাঁর শৈশব, কৈশোর বয়ঃসন্ধি ও প্রথম যৌবন কেটেছে এই আসন্ন যুদ্ধের অপচ্ছায়ায় । তাঁর পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয় কৈশোরেই, বাকি দু’বোনের মৃত্যু হয় ন্যাৎসীদের মারণক্যাম্পে ১৯৪২। তিনি নিজেও দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী ছিলেন না । কিন্তু তবুও জীবনের এতগুলো বাঁধা অতিক্রম করে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাসসমূহ ।

যদিও তিনি নিজে সবগুলো উপন্যাসের প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি । আর জীবিত কালে তিনি এত জনপ্রিয়ও হননি । এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে - উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হল-'ফার্স্ট লঙ ট্রেন জার্নি', 'দি জাজমেন্ট', 'দি আমেরিকা', 'দি ট্রায়াল', 'মেটামরফোসিস', 'দরিদ্র স্কুল শিক্ষক', 'এ হান্টার আর্টিস্ট', 'দি কাসল' ইত্যাদি । পূর্বেই বলেছি ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় যে সমস্ত পাশ্চাত্য লেখকের কথা বলা হয় তাঁদের মধ্যে ফ্রান্স কাফকা প্রথম । খুব সম্ভবত ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপর এর প্রভাব অধিক মনে করার কারণ উভয়ের ব্যক্তিজীবনের কিছু কিছু সাদৃশ্য । যেমন ফ্রান্স কাফকার মত ওয়ালীউল্লাহ্‌রও ছিল আত্মপরিচয়ের সংকট, আত্মপ্রকাশের ভাষা নির্বাচনের দ্বন্দ্ব। কাফকা যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ইহুদীদের কোন বাসভূমি ছিল না, যাকে তারা স্বভূমি বলে গ্রহণ করবে । অপরদিকে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর সময়ে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের মাধ্যমে 'পাকিস্তান' নামে এক ভূখন্ড পেয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি। তিনিও তাঁর যৌবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন এক সামাজিক অস্থিরতায় । দেখেছেন শতাব্দীর বৃহত্তর মন্বন্তর, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা । দুজনেই দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন । দু'লেখকেরই বিভিন্ন বিষয়ে ছিল অগাধ পান্ডিত্য । ফ্রান্স কাফকার সঙ্গে এভাবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিল ছিল তেমনি অমিলও ছিল প্রচুর ।

যাই হোক ফ্রানস্‌ কাফকার যে সকল রচনার সঙ্গে সাধারণত ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার সাদৃশ্যের কথা বলা হয়ে থাকে সেগুলো হল-'চাঁদের অমাবস্যা'-র সঙ্গে কাফকার 'দি ট্রায়াল' এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো'-র সঙ্গে 'কেল্লা' উপন্যাসের । 'দ্য ট্রায়াল' শুধু কাফকারই নয় এটি সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । এটি ১৯১৪ -১৯১৫ সালে লিখিত হলেও প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯২৫ । বলা হয়ে থাকে আরেক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডস্টভয়স্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' এবং 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ' উপন্যাসের প্রভাব রয়েছে এতে । উপন্যাসটিতে যে সমস্ত চরিত্ররা রয়েছেন তাঁরা হলেন -উপন্যাসের নায়ক জোসেফ কা, তার নায়িকা ফ্রুয়েন মন্টাগ -(এর সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙ্গার পরে পরেই জোসেফ কা অ্যারেস্ট হন), উইলিয়াম এবং ফ্রান্স নামক দুজন অফিসার যারা জোসেফকে অ্যারেস্ট করেন, একজন ইন্সপেক্টর, রবিনস্টেইনার, কুলিচ এবং কামেনিয়ার নামে অধঃস্তন ব্যাঙ্ক কর্মী যারা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, ফ্রাঁ গুরবাক, একজন মহিলা, ছাত্র, নির্দেশক জাজ, আঙ্কেল কার্ল, হার হেল্ড নামক উকিল, লেনি নামক নার্স, অ্যালবার্ট, ফ্লগার, রাষ্ট্রপতি। উপ-রাষ্ট্রপতি, রুডি ব্লক নামক

ব্যবসায়ী, টিটোরেলি নামক চিত্রশিল্পী, একজন যাজক, প্রিজন ক্যাপ্টেন, একজন দারোয়ান এবং একজন কৃষক । এরাই হলেন উপন্যাসের চরিত্র । উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই একটি ব্যাঙ্কের প্রধান ব্যবস্থাপক জোসেফ কা হঠাৎই তার ত্রিশতম জন্মদিনে দুজন পুলিশ দ্বারা গ্রেফতার হয় । কারণ তার নামে কেউ মিথ্যা অভিযোগ করেছে । এদিনের শুরু থেকেই তার সব কিছুই ভুল হতে থাকে । তার বাড়িওয়ালীর রাঁধুনী যে তাকে প্রতিদিন সকাল আটটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট দিয়ে যেত এদিন সে ভুল করে দিয়ে যায় না । এমন ভুল তার আগে কখনো হয়নি কিন্তু আজ হয় । প্রাতরাশ আসবে এই আশায় সে অপেক্ষা করতে করতে এক সময় বালিশে মাথা দিয়ে উঁকি মেরে পাশের বাড়ির জানালার দিকে তাকাল । তখন তার মনে হল পাশের বাড়ির বৃদ্ধা উঁকি মেরে কেমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তার দিকেই দেখছিল । তারপর সে ক্ষুধার্ত মনে হওয়ায় ঘন্টা বাজায় । আর ঠিক তখনই এমন দুজন লোক তার গৃহে প্রবেশ করে যাদের তিনি আগে দেখেন নি । জোসেফকে প্রথমেই জেলে বন্দী করা হয় না । তাকে প্রথমে নজর বন্দী করা হয় । তার গতিবিধির ওপর সব সময়ই সরকারী মহল থেকে দৃষ্টি রাখা হয় । জোসেফ কা পুনরায় তার অফিসে যেতে শুরু করে । কিন্তু সে অনুভব করে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা-পরিবেশ যেন আর আগের মত নেই । সবাই তাকে কেমন যেন এড়িয়ে চলতে শুরু করে । একসময় তার মনে হয় সে গ্রেপ্তার হলেই বুঝি তার চাইতে ভালো হত । পরবর্তীতে সে সত্যিই গ্রেপ্তার হয় এবং বিনা দোষে জল্লাদের হাতে প্রাণ বিসর্জন করে । শেষ পর্যন্তও এই যুবক জানতে পারে না তার বিরুদ্ধে অভিযোগই বা কি বা কে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। একবছর ধরে ক্রমাগতভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন আইনব্যবস্থার গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে সে লাভ করে অদেখা, অজানা আদালতের দন্ডাজ্ঞা । বন্দিত্বের জের টানতে টানতে তার একত্রিশতম জন্মদিনের প্রাক্কালে দু'জন জল্লাদের হাতে অমানুষিকভাবে প্রাণ দেয় । অপরদিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা'-উপন্যাস শুরু হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে । জোসেফের দিনের শুরুতেই যেমন ছিল এক অশুভ ইঙ্গিত, আরেফ আলীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় । তার রাতটি শুরু হয়েছিল এক শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে। শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত'-এ আরেফ আলী নামক এক নিরীহ যুবক জড়িয়ে পড়ে এক হত্যাকান্ডের সঙ্গে, যার শেষে নির্দোষ আরেফ আলীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয় । দুটো উপন্যাসের মধ্যে মিল বলতে এটুকুই । বরং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে উভয় উপন্যাসে মিলের থেকে অমিলটাই বেশি চোখে পড়বে । যেমন ওয়ালীউল্লাহ্‌র আরেফ আলী স্বেচ্ছায় নিজের পরিণতির

দিকে এগিয়ে গেছে । সে জানত 'বড় বাড়ির কাদেরই যে বাঁশঝাড়ের যুবতী মাঝি বউ-এর হত্যাকারী'-একথা জানালে প্রথমত, কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না কারণ সমাজে কাদের দরবেশ নামে পরিচিত । দ্বিতীয়ত, সে দরিদ্র মায়ের একমাত্র রোজগেরে সন্তান। আর তার পক্ষে এই উপার্জন করা সম্ভব হয় বড়বাড়ির দয়াতেই । সত্য কথা বললে তার সেই উপার্জন চলে যাবে । তৃতীয়ত, বিশ্বাস করলেও বড়বাড়ির লোক নিজেদের সম্মান রক্ষায় ঘটনাটি ধামাচাপা দিয়ে দেবে । উপরন্তু নির্দোষ আরেফ আলীকেই দোষী সাব্যস্ত করবে । সত্য ঘটনা জানানোর সম্ভাব্য ফল কী কী হতে পারে তার সবই সে নিজের মনে বিশ্লেষণ করে দেখেছে-

''যুবক শিক্ষকের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, যুবতী নারীর মৃত্যুর সুবিচার হোক, তার চেষ্টা করলে কেউ তাকে সমর্থন করবে না, কেউ তাকে সাধু-সত্যবান বলে তার গলায় মালা দেবে না । সত্যবাদিতার মূল্য অবশ্য কেউ খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করে না । এ-কথাও কেউ অস্বীকার করে না যে, সাক্ষ্য দেবার সমন পড়লে মিথ্যা বলা অন্যায়-বিশেষ করে মিথ্যাবিবৃতি যখন ধরা পড়ে । কিন্তু যুবক শিক্ষককে কেউ সমন পাঠায় নাই । স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সত্যকথা বললে, এবং তার জন্য শাস্তি লাভ করলে, তাকে তারা নির্বোধই বলবে ।''[৬]

কিন্তু তবুও সমস্ত কিছু জেনেও যুবক শিক্ষক সত্য ঘটনা জানানোর সিদ্ধান্ত নেয় । কারণ সে কিছুতেই এত সহজে একটা মৃত্যুকে মেনে নিতে পারে না । তার শুধু মনে হয়-

''পুলিশ-কর্মচারীর সামনে বসে যুবক শিক্ষকের হয়তো এই ধারণা হয় যে, কে শাস্তি পাবে সেটি আর প্রধান কথা নয় । শাস্তিটার অর্থ যখন মৃত যুবতী নারীর কাছে আর পৌঁছবে না, তখন কে শাস্তি পাবে তাতে আর কী এসে যাবে ? শাস্তিটা তার জন্যে নয় । যুবক শিক্ষক যদি ভুল করে শাস্তিটা নিজের ওপরই টেনে আনে, যুবতী নারীর মৃত্যুর জন্যে সে-ই যদি অবশেষে শাস্তি পায়, তবে শাস্তিটা আসলে যার উদ্দেশ্যে সেখানে তা পৌঁছুবে । সে কথায় সে কি একবার স্বান্তনা পেতে পারে না ?''[৭]

সমালোচক জীনাত ইমতিয়াজ আলী তাঁর 'চাঁদের অমাবস্যা ' প্রবন্ধে আরেফ আলীর অন্তর আদালতের সঙ্গে কাফকার 'দ্য ট্রায়াল' উপন্যাসের জোসেফ কার মনের আদালতের তুলনা করেছেন । উৎস হিসেবে তিনি কাফকার বিচার উপন্যাসের 'প্রথম সওয়াল এবং শূন্য সাওয়াল.....ঘরে' শীর্ষক অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন- 'এই অন্তঃক্ষরণ ও আপাত সামঞ্জস্যকে উপজীব্য করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে পাশ্চাত্য প্রভাবসম্পর্কিত একটি বিবেচনাও প্রস্তুত করা যায় । আবার কাজী মোস্তায়ীন বিল্লাহ উপন্যাসের সংঘটন আরম্ভের

জন্য দ্বন্দ্বহীন লগ্ন নির্বাচনে সাদৃশ্য চয়ন করেছেন তাঁর 'চাঁদের অমাবস্যা' ও বিচার' উপন্যাসের মধ্যে । 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটির শুরুতেই রয়েছে-শীতের উজ্জ্বল জ্যোস্নারাত। কিন্তু শীতের সেই উজ্জ্বল রাতকে ম্লান করে দিয়েই আসে যুবতী নারীর মৃতদেহের কথা, যেখানে আরেফ আলী বাঁশঝাড়ের মধ্যে দেখতে পায় এক যুবতীর অর্ধ উলঙ্গ মৃতদেহ । অবশ্য বিষয়টা বুঝতে তার একটু সময় লাগে । কারণ বিষয়টা আর পাঁচটা বিষয়ের মত স্বাভাবিক নয় । অন্যদিকে কাফকার উপন্যাস শুরু হয়েছে আরও সুনির্দিষ্টভাবে । 'চাঁদের অমাবস্যা' যেখানে শেষ হয়েছে আরেফ আলীর গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে সেখানে কাফকার উপন্যাসে শুরুতেই জোসেফকে গ্রেপ্তার করা হয় কোন মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে । উপন্যাসের শুরুতেই নায়ককে বন্দী করা হয় । আর এই বন্দিত্বের জের টানতে টানতে তার একত্রিশতম জন্মদিনের প্রাক্কালে দু'জন জল্লাদের হাতে অমানুষিকভাবে প্রাণ দেয় । আর কাফকার রচনার সেই বন্দিত্বের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আরেফ আলীর স্বেচ্ছাবন্দিত্বের কোন মিল নেই । জোসেফের ক্ষেত্রে উপন্যাসের অন্তিমে যে স্বীকারোক্তি রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে কাফকার নিজস্ব জীবনবোধজাত । অভিযুক্ত জোসেফের ত্রিশতম জন্মদিন শুরু হয় প্রাতরাশহীনভাবে, দুই জমাদারের জোর করে বিছানা থেকে টেনে তোলা থেকে । আর আরেফ আলীর সকাল সন্ধ্যা শুরু হয় এক শান্ত-স্নিগ্ধ পটভূমিতে । প্রকৃতপক্ষে কাফকার রচনায় যে সর্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতা দেখা যায় তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় নেই । এছাড়া 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে আরেফ আলীর যে অন্বেষণ তা কাফকার 'দি ট্রায়াল'-এ জোসেফ চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় না । সেখানে জোসেফ তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা অন্যায় শাস্তি পেয়েছে । কাফকায় রয়েছে সর্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতা ও বিমানবিকরণ, ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাহিনির সঙ্গে কোনও স্তরে যার কোন সাদৃশ্য নেই । অধিকন্তু যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকলে কাফকাসুলভ রচনা বলা চলে সে সকল বৈশিষ্ট্য 'চাঁদের অমাবস্যা'-য় ফুটে ওঠে নি । কিন্তু তা হলেও কাহিনির উপরিস্তরের এই সাদৃশ্য, কাফকার উপন্যাসের চরিত্রদের মতো নাম উল্লেখ না করে পেশাভিত্তিক পরিচয়ে উল্লেখ করা , যেমন-আরেফ আলী না বলে সর্বত্র 'যুবক শিক্ষক', মাঝি বউ এর পরিচয় না দিয়ে 'যুবতী নারী', বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাউকে 'বক্তা', কাউকে 'মৌলবির শিক্ষক', 'প্রধান শিক্ষক', 'প্রশ্নকর্তা', 'মাস্টার', 'পুলিশ-কর্মচারী' পরিচয়ে অভিহিত করা ইত্যাদি দেখে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় কাফকার প্রভাব সম্পর্কে একটা ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় । তবে এই সাদৃশ্য নিতান্তই বাহ্যিক । কাফকার নায়কের অপমৃত্যু

তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে । অপরপক্ষে আরেফ আলী বাঁশঝাড়ে অপঘাতে মৃত এক নারীর মৃত্যুর জন্য অপরাধীকে অভিযুক্ত করতে কাঠগড়ায় উঠেছে বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং নিজের পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েই । তাই আরেফ আলী এবং জোসেফ কার সঙ্গে যে সামঞ্জস্যের কথা সমালোচকগণ বলে থাকেন তার কোন অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না । 'চাঁদের অমাবস্যা' ছাড়াও ওয়ালীউল্লাহের 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের সঙ্গে কাফকার 'কেল্লা' উপন্যাসের তুলনা করা হয় । 'কাঁদো নদী কাঁদো'- উপন্যাসে দেখি বাকাল নদী শুকিয়ে গেলে কুমুরডাঙ্গার বাসিন্দাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পরে । কারণ জলের গভীরতা কমে যাওয়ায় নদীতে স্টীমার চলাচল করা বন্ধ হয়ে যায়, যে স্টিমার ছিল তাদের বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম । অপরপক্ষে কাফকার 'কেল্লা'-তে রয়েছে একটি দুর্গ ও তার পাদদেশের অধিবাসীদের শঙ্কার কথা । দুর্গটি বাইরের জগতের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । কেল্লাটি যে জনপদের মধ্যে অবস্থিত তারা কেউ জানে না এর মালিক কে ? এমনকি কেল্লার কর্মচারীরাও জানে না । আসলে তাদের জানতে দেয়া হয় না । এমন একটি দুর্ভেদ্য কেল্লায় প্রবেশ করতে চায় উপন্যাসের নায়ক 'কা' । কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সে কেল্লায় কখনও ঢুকতে পারে না । উভয় উপন্যাসের এই বিচ্ছিন্নতা, অর্থাৎ জনপদ থেকে কেল্লার বিচ্ছিন্নতা এবং কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের বিচ্ছিন্নতাকে বহু সমালোচক যেমন- সৈয়দ মনজুর ইসলাম, আবু রুশদ এক করে দেখেছেন । কিন্তু শ্রেণিগত বিচারে উভয় উপন্যাসের মধ্যে কোন মিল নেই । কারণ, 'কেল্লা' উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে একটি কেল্লা যা নিয়ন্ত্রণ করছে কেল্লাবাসী, পাদদেশের অধিবাসী ও উপন্যাসের নায়ক 'কা' কে । এখানে আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতীক এই কেল্লা । যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একটা গোটা জনপদ । আর 'কাঁদো নদী কাঁদো'-উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে মুহাম্মদ মুস্তফার আত্মহত্যা এবং তার সমান্তরালে একটি নদীর মৃত্যু । এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র ও নিজস্ব শ্রেণি পরিচয়ে বর্তমান । ওয়ালীউল্লাহের উপন্যাসে বাকাল নদী শুকিয়ে যাওয়ার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একটা গোটা জনপদ কিন্তু কাফকার উপন্যাসে তা হয়নি। সেখানে কেল্লার পাশে বসবাসকারী অধিবাসীরা দুর্গটিকে ভয় পায় ঠিকই কিন্তু তাদের সেভাবে কোন ক্ষতি হয় না, শুধুমাত্র উপন্যাসের নায়ক 'কা'-ব্যতীত। 'দি ট্রায়াল'- উপন্যাসে যোসেফ যেমন শেষ পর্যন্ত ন্যায় বিচার পায় না, তেমনি -'কেল্লা'-উপন্যাসেও 'কা' দরজার পর দরজা খুলেও কেল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না । তাই এই জগদ্দল নিয়তির সঙ্গে কুমুরডাঙ্গার অলৌকিকতা তাড়িত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বতাড়িত লড়াইয়ের খুব বেশি সাদৃশ্য নেই।

ফ্রান্স কাফকা ছাড়াও আর যে কজন প্রভাবশালী দার্শনিক-লেখকের কথা উল্লেখ করা হয় তাদের মধ্যে রয়েছেন জাঁ পল সার্ত্র । ওয়ালীউল্লাহের সাহিত্যে জাঁ পল সার্ত্র-র প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমরা একবার দেখে নেব সার্ত্রের ব্যক্তি জীবনের দিকে । কারণ যে কোন লেখকের সাহিত্যকে ভালোভাবে বুঝতে হলে প্রথমেই তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনকে বুঝে নেওয়া উচিত । জাঁ পল সার্ত্র ফ্রান্সের পারীতে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২১-শে জুন জন্মগ্রহণ করেন । বিশ্ববিখ্যাত এই লেখক দার্শনিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক মাত্র দু'বছর বয়সেই তাঁর নৌ-প্রকৌশলী পিতা জেন-ব্যপিস্টার-সার্ত্রে-কে হারান । পিতাকে হারানোর পর তাঁর দ্বায়িত্ব নেন তাঁর অধ্যাপক মাতামহ শোয়াইৎজার । এই মাতামহের ভূমিকা সার্ত্রের জীবনে অপরিসীম । তাঁর অধ্যাপক জীবনের কৃচ্ছতা, উচ্চ-চিন্তাময়তা, কর্তৃত্ব সব মিলে সার্ত্রের জীবনে তিনি নিছক মাতামহ নন বরং অনতিগম্য ঈশ্বরের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । তবে সার্ত্রের শৈশব খুব একটা সুখের ছিল না । কারণ বাল্য বয়সে তিনি দেখতে খুব বেশি ভালো ছিলেন না । তিনি ছিলেন খর্বাকৃতি । তার কিছু শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল । যে কারণে তার বয়সি অন্যান্য ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে খেলা-ধূলায় উৎসাহী ছিল না । তিনি প্রতিদিন তার মায়ের হাত ধরে পার্কে যেতেন যদি তার সঙ্গে কেউ খেলায় উৎসাহী হয় এই আশায় । কিন্তু প্রতিদিনই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতেন আর নানারকম আজগুবি বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করতেন । আর এখান থেকেই তার চিন্তার ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণ হতে শুরু হয় । এভাবে মাতামহের পরিবারে বড় হতে হতে তার এগার বছর বয়সে তার মাতার পুনরায় বিবাহ হলে তিনি মাতার সঙ্গে বিপিতার গৃহে যান ও সেখানে এক স্নেহময়ী জার্মান ধাত্রীর কাছে বড় হতে থাকেন । এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে স্মৃতিতে উঁকি দিতে পারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের মাতৃবিয়াগের এবং তার বিমাতার কাছে লালন-পালনের কথা । তবে সার্ত্রের আত্মজীবনী মূলক রচনা 'শব্দ'-তে মাতার সঙ্গে সার্ত্রের কোন দূরত্বের কথা আমরা পাই না । বরং গ্রন্থটিতে তাঁর মায়ের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে মনে হয় মাতা অ্যান মারিকে তিনি মাতৃমূর্তিতে ততটা নয় যতটা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর স্থলাভিষিক্ত করে দেখেছেন । ছাত্র হিসেবে তিনি বরাবরই ভালো ছিলেন । প্যারীসের একোল নর্মাল সুপিরিয়র থেকে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন । এখানেই তাঁর অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় যারা পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিভাগে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন । যেমন-লেখিকা সিমোন দ্য বোভেয়ার, নৃতত্ত্ববিদ ক্লড-লেভি-স্ট্রাস, দার্শনিক সিমোন উইল প্রমুখ । পরবর্তীতে সিমোন দ্য বোভেয়ার সার্ত্রের সারাজীবনের সঙ্গী

হয়েছিলেন । যদিও তারা প্রথাগতভাবে বিবাহ করেননি । কারণ বিবাহ নামক পরিকাঠামোটির প্রতি তাঁদের কোন বিশ্বাস ছিল না । পড়াশোনা শেষ করার পর ১৯৩১-১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি-লি হার্ভ, লিয়ন এবং পারীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এরপর ১৯৩৪-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারীসের লুইসে কন্ডাক্ট-এ শিক্ষকতা করেন । ছোটবেলা থেকেই যার লেখক হবার সাধ ছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস অবশেষে বেরোয় ১৯৩৮ সালে । গ্রন্থের নাম 'বিবমিষা' বা 'Nausea' । যার অর্থ- 'বমি করার প্রবণতা' । তাঁর কালজয়ী গ্রন্থগুলো হল-

1936-Imagination : A psychological Critic .

1938-Nausea

1939-"The Wall" (in Intimacy);" "The Sketch for a Theory of the Emotions''

1940-The Psychology of Imagination

1943-The Flies; Being and Nothingness

1944-No Exit

1945- The Age of Reason, The Reprieve

1948-Dirty Hands Situations (Vols.1)

1949-Iron In The Soul, Situations (Vols.3)

1951-The Devil and the Good Lord

1952-Saint Genet:Comedien et Martyr

1954-Kean

1955- Nekrassov.

1959-The Condemned of Altona

1960-Critique of Dialectical Reason

1963-The Words

1971-Flaubert (Vols.1&2)

1972- Flaubert (Vols.3: The Family Idiot)

সার্ত্রের প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রকাশ পাওয়া যায় । সার্ত্রে আর অস্তিত্ববাদ শব্দ দুটি মূলত একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ । প্রকৃতপক্ষে 'অস্তিত্ববাদ' শব্দটির সঙ্গে জড়িত নামগুলো হল জা পল সার্ত্র, সিমোন দ্য বোভেয়ার, গাব্রিয়েল মার্সেল প্রমুখ । এরা ১৯৪০-১৯৫০ -এর মধ্যকার জটিল দার্শনিক সাহিত্যিক মনোবৈশ্লেষণিক-ধর্মীয় ও ধর্মবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা যা পরবর্তীকালে অস্তিত্ববাদ নামে পরিচিত হয় । সার্ত্রের যে কোন রচনার মূল বৈশিষ্ট্য এই অস্তিত্ববাদ । তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বিবমিষা'-তে তিনি সেই অস্তিত্ববাদের কথাই ছত্রে ছত্রে বলে গেছেন । ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে সার্ত্রের এই অস্তিত্ববাদের প্রভাবের কথা যারা বার বার বলেছেন তাঁরা হলেন -

কাজী মোস্তায়িন বিল্লাহ (নিঃশব্দ ঘূর্ণিঝড়: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা', বাংলা অ্যাকাডেমী পত্রিকা, ১৯৭৬, পৃ-১৩৮),

দেবীপদ ভট্টাচার্য (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা': দ্বিতীয় চিন্তা, ভাষা সাহিত্য পত্র, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৫, পৃ-২৭),

শিব নারায়ণ রায়, (রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়র ও নক্ষত্র সংকেত, ১৯৮৩, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ-১৪৯)

শওকত আলী, ('সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস',নিরন্তর, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৫, পৃ-৪৩,)

তানভীর মোকাম্মেল, ('সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্', সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯২, প-১৭)

জীনাত ইমতিয়াজ আলী ('সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্': জীবন দর্শন ও সাহিত্যকর্ম) ঢাকা, ১৯৯২, পৃ-২৫,

সৌদা আখতার, (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চাঁদের অমাবস্যা', সাহিত্য পত্রিকা, ৩৩ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, পৃ-৯৭)

তবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের প্রভাব কতটা রয়েছে বা তিনি সত্যি প্রভাবিত হয়েছেন কিনা তা জানার পূর্বে প্রথমে আমরা একবার বুঝে নেব অস্তিত্ববাদ বিষয়টি ঠিক কি ?

পূর্বেই বলেছি সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রচারক হিসেবে পরিচিত হলেও শুধুমাত্র তাকেই এর প্রবর্তক বলা যায় না । তাছাড়া অস্তিত্ববাদ শুধুমাত্র কিছু সুনির্দিষ্ট মতবাদের সমষ্টি নয়, দার্শনিকরনের অন্যতম পন্থা । কাজেই কোন একজনকে এর প্রতিষ্ঠাতা ভাবার কোন

অবকাশ নেই । বলা যেতে পারে জার্মান রোমান্টিসিজমের ভেতরে ছিল অস্তিত্ববাদের বীজ এবং আধুনিককালে জার্মান দার্শনিক এডমুন্ড হুসার্লের 'মানস ঘটনাবাদ' থেকে এর উদ্ভব ঘটেছে । অস্তিবাদী দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে রক্তমাংসের মানুষ ও তার অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা । জগত ও মানুষের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক অনুধাবন করা তার অস্তিত্বের বাস্তবতার মধ্যে পড়ে। তবে প্রচলিত দর্শনের মত সুপরিকল্পিত শৃঙ্খলা-যুক্তি-বন্ধন এতে নেই । এ দর্শনে যুক্তির বদলে অনুভূতি ও কর্ম প্রাধান্য পেয়েছে । এ দর্শন বিষয়ীর দর্শন , বিষয়ের দর্শন নয় । এ দর্শনের মূল কথা, ব্যক্তিরূপে মানুষের বিশেষ মূল্যের এবং নিজের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যক্তির স্বাধীন ক্ষমতা ও দায়িত্বের স্বীকৃতি । অস্তিবাদ অনুযায়ী দেখলে আমাদের কাছে এই বিরাট জগত ঠিক ততটুকুই যতটুকু আমি এর জুড়ে আছি ।

দর্শনের ইতিহাসে আমরা দেখি যে দার্শনিকেরা তত্ত্বজিজ্ঞাসায় আগ্রহী এবং তাঁরা মনে করেন জগতের একটি মূল তত্ত্ব আছে যার রহস্যভেদে তারা নিয়োজিত । মানুষের বেলাতেও তাঁরা একটি আত্মস্বরূপের কথা বলেন যার স্বরূপ জানলে মানুষের সব দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি হয় -অস্তিত্ববাদীরা এরকম কোন পরমতত্ত্ব স্বীকার করেন না । যুক্তিবাদী দর্শনবেত্তা বলে পরিচিত যারা, সেই প্লেটো, দেকার্ত, হেগেল প্রমুখরা মনে করেন যে, মানুষের একটি সারধর্ম বা essence আছে, এবং সেটি অস্তিত্ব নির্ধারণ করে। এদের যুক্তিপ্রধান তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় অস্তিত্বের সমস্যাগুলি উপেক্ষিত । কিন্তু 'অস্তিত্ববাদ'-এর মূলকথা 'অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্ববর্তী,' তাই বলা যায় এটি ভাববাদী দর্শনচিন্তার বিপরীত কোটির ভাবনা । অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন যে, মানুষ অচেতন বস্তুসমূহের মত কতগুলি দৈব বা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় না , সে স্বাধীন । আপন কর্মের মধ্য দিয়েই তার সারধর্ম গড়ে তোলে । ভাববাদ ব্যক্তি মানুষকে এক পরমসত্তা বা নৈর্ব্যক্তিক সার্বিক বুদ্ধির অংশ রূপে দেখেছে । আর প্রকৃতিবাদী চিন্তায় মানুষকে জড় জগতের অংশ হিসেবে যান্ত্রিক নিয়মকানুনের ক্রিয়ানক হিসেবে ভাবা হয়েছে । এ দুয়ের বিরূদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় অস্তিবাদ মানবজীবন ও অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় ব্রতী হয় । যুক্তি-বুদ্ধি-বিমূর্ত ধ্যানময়তার বিরূদ্ধে হৃদয়াবেগ ও অনুভবের এক বিদ্রোহ অস্তিবাদ । রোমান্টিসিজমের এক আধুনিক অভিব্যক্তি, যার প্রভাব এ-কালের সাহিত্যে মোটেই উপেক্ষণীয় নয় ।

জার্মান কল্পরম্যবাদীদের ভাবশিষ্য ডেনমার্কের ধর্মতাত্ত্বিক সোরেন কিয়ের্কেগার্দ তাঁর Either-Or গ্রন্থে অস্তিবাদী দর্শনের প্রথম সূত্রপাত করেন ১৮৪৩ সালে । হেগেলীয় দার্শনিক

তত্ত্বের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কিয়ের্কেগার্দ বলেন যে, দর্শনের কাজ জীবনকে উপলব্ধি করা এবং সে জীবন ব্যক্তি নিরেপেক্ষ সামগ্রিক সত্তা নয় । তত্ত্ব ও তথ্য সন্ধান জীবনের সবচেয়ে বড় কথা নয় ,জীবনের সবচাইতে বড় সত্য অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা । ব্যক্তি কখনো পরিসমাপ্ত পদার্থ বা Finished product নয়, সে সততই বিকাশমান । আর এই সক্রিয়তা অবিরাম প্রচেষ্টা'র দ্বারা সম্ভব হয় । যে প্রচেষ্টা তার অন্তর্নিহিত স্বাধীনতার আকাঙ্খা থেকে উদ্ভূত । এই আকাঙ্খা কোন পরমসত্তা কর্তৃক সঞ্চারিত নয় । যে কোন ব্যক্তি কেবল মাত্র একজন বৌদ্ধিক জ্ঞাতা নয়, সে হৃদয়াবেগ, ইচ্ছা ও সংকল্প সমন্বিত এক সম্পর্ণ 'অস্তিশীল' ব্যক্তি ।

অস্তিবাদের বিস্তার ও চর্চার মূল ক্ষেত্রটিভূমিটি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানি ও ফ্রান্স । এ প্রসঙ্গে দুজনের কথা বিশেষভাবে বলতে হয় । এদের মধ্যে একজন মার্টিন হাইডেগার ও অন্যজন কার্ল ইয়াসপার্স । হাইডেগারের সারকথা -আমরা প্রত্যেকেই অস্তিত্বরূপে অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত । এই নিক্ষিপ্ত হওয়ার অনুভূতিকে তিনি বলেছেন 'Throwness': আমরা কোথা থেকে আসি এবং কোথায় যাই তা জানিনা । প্রতিদিনের জীবনে মানুষ নামহীন একজন, কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয় । এই প্রাত্যহিক জীবন তাই হাইডেগারের মতে অযথার্থ অস্তিত্ব । মানুষ যখন তার নিজের চরম সম্ভাবনাকে সফল করতে এগিয়ে যায়, তখনি সে তার স্বাতন্ত্র ও স্বকীয় একাকীত্ব বুঝতে পারে । এই চরম সম্ভাবনা , হাইডেগার বলেছেন ব্যক্তির মৃত্যু , কারণ মৃত্যুই ব্যক্তির জীবনকে পূর্ণরূপ দিতে পারে । কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত হলেও তার ক্ষণ অনিশ্চিত । এই অনিশ্চয়তা ব্যক্তির জীবনে উদ্বেগের জন্ম দেয় । এই বোধ সৃষ্টি করে যে, আমরা যাকে সত্তা বলে মনে করি তা আসলে শূন্যতা । এই উদ্বেগ ও শূন্যতাবোধের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে কর্মপন্থা নির্বাচন করতে হয় । হাইডেগারের ব্যাখ্যানুযায়ী একমাত্র মানুষই অস্তিত্বশীল । ঈশ্বর আছেন কিন্তু তার অস্তিত্ব নেই । এই মানুষকে যে শব্দ দিয়ে হাইডেগার বুঝিয়েছেন তা হল 'Dasein, যার অর্থ 'তত্র-সত্তা' (Being there)। মানুষ হল সেই সত্তা যে তাৎক্ষণিকভাবে জগতে উপস্থিত এবং যাকে জগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যেই তার জীবন কাটাতে হয় ।

হাইডেগার ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রশ্নে উদাসীন ছিলেন, কিন্তু আস্তিক্যবাদী কার্ল ইয়াসপার্স পরমসত্তা বা ঈশ্বরের প্রত্যয়ী । ইয়াসপার্সের মত অনুযায়ী মানুষ সব কিছু থেকে পুরোপুরি স্বাধীন নয় । তার স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা 'Authentic self' বা জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত,

ব্যক্তির অস্তিত্ব এক সীমাহীন অসঙ্গসত্তা বা 'Absoulute self' -এর সঙ্গে বিজড়িত । এই পরমার্থিক সত্তার কোন সাক্ষাৎ উপলব্ধি পাওয়া যায় না । কিছু প্রান্তবর্তী পরিস্থিতিতে শুধু প্রতীকের মাধ্যমে এই সত্তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রতীত হয় । এই প্রান্তবর্তী পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে দুঃখ-কষ্ট, অপরাধবোধ, সংগ্রাম, হতাশা, মৃত্যু ইত্যাদি । অস্তিবাদী দর্শন ও দার্শনিকদের মোটের ওপর দু'ভাগে ভাগ করা যায় । যার একভাগে ঈশ্বরে বিশ্বাসী অর্থাৎ আস্তিকেরা যেমন কিয়ের্কেগাদ এবং ইয়ার্সপার্স; ফরাসি দার্শনিক গ্যাব্রিয়েল মার্সেলও এই শিবিরভুক্ত । অন্যদিকে হাইডেগার, জার্মান দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্র ।

মোট কথা 'ব্যক্তিসত্তাই অস্তি, সত্তা ব্যতীত সমস্তই বায়বীয়, শূন্যতাময়'-এই যে আমি, স্বয়ম্ভূ, স্বরাট, আমিত্ব, চাঞ্চল্যমুক্ত, আত্মস্থ, স্বাধীন, বহিঃসংস্কারবর্জিত 'আমি'র সঙ্গে কোন ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকল না, সে আবার নিজেকে কোন কারিগরের সৃষ্ট ভাবল না, নিজেকে ভেবে নিল নিছক অবজেকটিভিটি বলে যা প্রথমে অস্তিত্ব ও পরে বহমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিস্বিকতা অর্জন করে । সার্ত্রে এই নিরীশ্বরবাদী দর্শনের কথা বলে অস্তিত্ববাদের একটা বাঁক নিয়ে আসেন । তিনি ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষকেই তার কর্মের জন্য দায়ী করেছেন । কারণ কার্যকারণের প্রতিটি পছন্দ ও সিদ্ধান্ত তারই । সার্ত্রের ভাবনায় ব্যক্তিসত্তার আবির্ভাব আকস্মিক ও অযৌক্তিক । এই সত্তার দুটি ভাগ -স্বরূপসত্তা ও স্বনিমিত্ত সত্তা । স্বরূপসত্তা হল অন্য কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ রহিত সত্তা । স্বনিমিত্ত্ব সত্তা হল 'চৈতন্য' যা শূন্যের বিনাশ সাধন করে আবির্ভূত হয় । ব্যক্তিসত্তা নিজেকে নির্মাণ করে ও তার স্বাধীন নির্বাচনক্ষমতার ব্যবহার করে তার মূল্যবোধগুলিকে সৃষ্টি করে । স্বাধীন বিশ শতকের দার্শনিক লেখকদের মধ্যে যারা দর্শনকে বিমূর্ত বিশ্ব থেকে বাস্তবের অভিজ্ঞতায় নিয়ে আসেন তাঁদের ন্যায় সার্ত্রও বিশ্বাস করতেন 'দায়বদ্ধতার সাহিত্যে' নিজেদের দর্শন ভাবনার প্রসার ঘটাবেন । এ উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'বিবমিষা' যেখানে আমরা তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হই । উপন্যাসটিতে আমরা দেখি নায়ক আঁতোয়া রকাঁত্যার বয়স বত্রিশ, তার কোন বন্ধন নেই, সে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন, আবার বাইরের বিশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার সচেতনতাও তীক্ষ্ণ । সে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করতে চায় । যেমন ছোট বাচ্চাদের মত রাস্তা থেকে ছেড়া চট বা কাগজ তুলে মুখে দেওয়া অথবা বাদাম কুড়ানো ইত্যাদি । কিন্তু কাজগুলো করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে সে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করতে পারছে না । তার এ সকল কাজের জন্য তার বান্ধবী তাকে ছেড়ে চলে যায় । নায়কের মনে হয় এভাবে

সে ধীরে ধীরে নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছে । সে ভাবে মানুষ ক্রমাগত নিজের সঙ্গে আত্মপ্রবঞ্চনা করে কাটিয়ে দেয় । আঁতোয়া চায় না নিজের সঙ্গে এই প্রবঞ্চনা করতে । জা পল সার্ত্রে তাঁর 'বিবমিষা' উপন্যাসে নায়কের এই আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে আত্মজ্ঞানের পথে উত্তরণের কাহিনিই বর্ণনা করেছেন । যদিও উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে এই রূপান্তর দেখানো অসম্ভব কিন্তু সার্ত্রে এই ধর্মান্তর ঘটানোর পদ্ধতিতে বিশ্বাসী । উপন্যাসের শুরুতে যে আঁতোয়া পন্ডিত, জীবনীকার, অসম্পর্কিত মানুষের জীবনের গাথাকার পরিণতিতে পৌঁছে সেই হয়ে যায় ধৈর্যশীল শ্রোতা, আমরা তাকে নীরবে বিরান পার্কে কোটপরা বৃদ্ধ লোকটির দিকে ছুটে আসা বালিকার দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করতে দেখি । জীবনের মানে সে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পায় । ওয়ালীউল্লাহের 'চাঁদের অমাবস্যার' আরেফ আলীর মধ্যে কিন্তু আমরা এই আত্মউত্তরণের কাহিনি দেখতে পাই না । বরং উপন্যাসটির কাহিনি নির্মান আলোচনা করলে দেখি এখানে রয়েছে সামগ্রিকভাবে নায়কের চিন্তনশক্তির প্রকাশ । আরেফ আলী আঁতোয়া রকাঁত্যার মত শিক্ষিত বা স্বচ্ছল নয় । সে অন্যের বাড়িতে আশ্রিত থেকে গ্রাসাচ্ছাদন করে এবং তাদেরই প্রতিষ্ঠিত স্কুলে চাকরি করে সংসার নির্বাহ করে । রকাঁত্যার মত উদ্দেশ্যহীন এবং অর্থহীন জীবন যাপন করার কোন সুযোগ এবং ইচ্ছা কোনটাই তার নেই । তার কোন উচ্চাভিলাষও নেই । বরং যে অবস্থায় সে আছে এটাই তার কাছে অনেক সৌভাগ্যের বিষয়-

''দু-বছর আগে আরেফ আলী শিক্ষক হয়ে এ গ্রামে আসে । থাকার আশ্রয় পায় বড় বাড়িতে । খাওয়া-দাওয়াও সেখানে হয়। তার বদলে বড়বাড়ির ছেলেদের দুইবেলা ঘরে পড়ায়। তার বিশ্বাস এই যে, যত নেয় তত সে দেয় না, কিন্তু সেটা দয়াশীল দাদাসাহেবেরই ব্যবস্থা। দাদাসাহেবের প্রতি তাই তার ভক্তি শ্রদ্ধার অন্ত নাই । দক্ষিণে তিন মাইল দূরে তার নিজের গ্রাম। দরিদ্র সংসার, হাতের তালুর মত এক টুকরো জমিতে জীবন ধারন চলে না। টেনে-হিচরে আই-এ পাশ করে সে দেশে ফিরে আসে । পড়তে পারলে আরো পাশ করত, কিন্তু কলেজের ফি, বই খাতা কেনার পয়সা আর জোগার হয় না । তাছাড়া , জেলা শহরে ঘুপসি-আস্তানায় থাকলেও খরচ হয় । একরত্তি শাক সবজির জমিটাও বিক্রি করে উচ্চশিক্ষার পশ্চাতে ছোটার অর্থ হয় না । বর্তমানে চাকুরিতে আরেফ আলীর অসন্তোষের কারণ নাই । বরঞ্চ তার বিশ্বাস, ভাগ্য দয়াবান না হলে এমন চাকুরি সহজে মিলত না ।.....

স্কুলের এবং সাথে সাথে নিজেরও আর্থিক এবং পদোন্নতির বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ । তাছাড়া, বর্তমান অবস্থাই-বা তেমন বিশেষ খারাপ কী ?''[৮]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার প্রেরণা বা রচনার উৎস হিসেবে যে কজন উত্তমর্ণ পূর্বসূরির উল্লেখ হয়ে থাকে তাঁদের মধ্যে আলজেরীয়ায় জাত ফরাসি কথাসাহিত্যিক আলবেয়ার কাম্যু অন্যতম । হোর্হে লুই বোর্হেস যে অর্থে বলেন 'প্রতিটি সৎ লেখকই নিজ নিজ পূর্বসূরি তৈরি করে নেন', যদিও আমরা নিশ্চিত নই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ এই লেখকের নিকটে সেই অর্থে ঋনী ছিলেন কিনা তা একবার যাচাই করে দেখা প্রয়োজন । ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিশ্লেষণে কাম্যুকে বিবেচনায় এনে অভিযুক্ত করেছেন অনেকে, যেমন-কাজী মোস্তায়িন বিল্লাহ্‌, দেবীপদ ভট্টাচার্য, শিব নারায়ণ রায়, তানভীর মোকাম্মেল, ('সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌', সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯২, প-১৭) জীনাত ইমতিয়াজ আলী ('সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌' : জীবন দর্শন ও সাহিত্যকর্ম ঢাকা, ১৯৯২, পৃ-২৫, শওকত আলী, আবু রুশদ, বশীর আলহেলাল প্রমুখ প্রাবন্ধিকগণ ।

আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে একবার স্মরণ করা সঙ্গত যে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে আলবেয়ার কাম্যুর প্রভাবের প্রসঙ্গ ওঠে তাঁর লোকান্তরিত হবার পরেই জীবিত অবস্থায় কখনও এবিষয়ে কেউ আলোচনা করেননি ।

আলবেয়ার কাম্যু ১৯১৩ সালের ৭ই নভেম্বর ফ্রান্স আলজেরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬০ সালের ৪ঠা জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন । তাঁর পিতার নাম লুসেন অগাস্ট কাম্যু। যিনি ছিলেন একজন কৃষি-প্রযুক্তিবিদ । মা ক্যাথেরিন-হেলেন-সিনটেস । তাঁর প্রথম স্ত্রী সিমোন হাই, দ্বিতীয় স্ত্রী ফ্রান্সিস ফাউড় । ফ্রান্সিস ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী এবং একজন গণিতবিদ। ইনি ১৯৪৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর দুই যমজ সন্তানের জন্ম দেন । তাঁদের সন্তানের নাম ক্যাথেরিন কামু এবং জেন কাম্যু । সাধারণত আলবেয়ার কাম্যু এবং ওয়ালীউল্লাহ্‌র যে সকল গ্রন্থের তুলনা করা হয় সেগুলো হল-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌	**আলবেয়ার কাম্যু**
১.'চাঁদের অমাবস্যা'	The Outsider
২.'কাঁদো নদী কাঁদো'	The Plague

এছাড়া জীবনের কিমিতিবাদী স্বভাব ও আত্মহত্যার প্রসঙ্গে আলবেয়ার কাম্যুর The Myth of Sisyphus শীর্ষক রচনাটির কথা উল্লেখ করা হয় । অতএব সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ও আলবেয়ার কাম্যুর মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধানে একটি সমান্তরাল অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং আলবেয়ার কাম্যু 'দি আউট সাইডার'-গ্রন্থের

সাদৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে উভয় উপন্যাসের নায়ক আরেফ আলী এবং ম্যর্সোকে একই নিক্তিতে মাপা হয় । কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি বিষয়কে কি কখনও একমানদন্ড দিয়ে মাপা উচিত ? না তা কখনও নির্ভুল হতে পারে ? কিন্তু এই ভুলটিই করা হয়েছে আরেফ আলী এবং ম্যর্সোর সঙ্গে । এরা দুজনেই স্বভাবে-চরিত্রে-মানসিকতায় সম্পূর্ণ আলাদা । আরেফ আলীর কাহিনিটি উপন্যাসে যথানিয়মে বর্ণিত, সংঘটিত এবং পরিণতিপ্রাপ্ত । অপরপক্ষে কাম্যুর নায়ক তার কারাকক্ষে বসে সময়হীন চেতনার মধ্যে কাহিনিটি উপস্থাপন করেছে যেখানে স্মৃতি সম্বলমাত্র, যে স্মৃতির মধ্যে তার প্রবৃত্তিময় বর্ণিল যাপিত জীবনের ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে ।

হ্যা, একথা ঠিক এর পরবর্তী ঘটনাক্রম সে ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যেতে পারত । তাকে আশ্রয় বা জীবিকা কোন কিছুই খোয়াতে হত না বা নির্দোষ হয়েও শাস্তি পেতে হত না। তাই আমাদের বুঝতে হবে আরেফ আলীর মত এক ছাপোষা, দরিদ্র শিক্ষক কেন এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিল? ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্রকে বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে লেখকের মানসিকতাকে । কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বহু ক্ষেত্রে লেখকের মানসিকতার প্রভাব পড়ে। ব্যক্তি ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছে নিজের স্বার্থের দায় থেকে জীবনের দায় ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ । এই জীবনের দায় থেকেই তিনি সুদূর প্যারিসে স্বচ্ছল জীবন-যাপন করেও নিজের স্বজাতি, পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি মুসলিমদের কথা ভেবেছেন , তাদের জন্য নিজের লেখাকে পিছিয়ে রেখেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই 'জীবনের দায়'-এর কথা আমরা জানতে পারি শওকত ওসমানের লেখা ডায়েরী থেকে--

''.....রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রস্তাব দিলে, সীনের ধারে ঘুরে আসা যাক কিছুক্ষণ । তথাস্তু । বেড়িয়ে দেখা গেল, জোরে ঠান্ডা বাতাস পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। এখন এগোনো চলে । ফেরার পথে তো মুখোমুখি লড়াই । তবু এগোতে লাগলাম । কিন্তু বেশি দূর যাওয়া গেল না । ঠান্ডার কামড় বেশ । আপাততঃ কান আছে কি নেই অবস্থা । মিনিট দশেকের মধ্যেই নিঃসাড় । তখন ফিরতে হলো । দীপালোকে দিবাপ্রায় রাত্রি । পরিচ্ছন্ন রাস্তা । হাঁটার আরাম হঠাৎ নিভে গেল হিমের দৌরাত্ম্যে ।

দুইজনে ফিরছি । হি হি বাতাসের ঝাপটা মুখে-বুকে । ওভার কোটে মানছে না । কান তো গায়েব । সঙ্গিকে সম্বোধন করে বললাম, ''১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে [১৮৬৫] দেনার দায়ে দিনে

বেরুতেন না, সন্ধ্যায় বেরুতেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত । এই সীন নদীরই ধারে হাঁটতেন । একশ বছর পরে আবার বাঙলা সাহিত্যের দুই মজুর সেই পথ দিয়ে হাঁটছে।''
বয়স্য গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলে, 'মধুসূদনের অর্থের দেনা ছিল-।' 'বিদ্যাসাগর-' আমার কথা চাপা প'ড়ে গেল সঙ্গীর আরো গম্ভীর উত্তরে, ''মধুসূদনের অর্থের দেনা ছিল, আমাদের মতো এতো জীবনের দেনা ছিল না তাঁর ।''[৯]

এই জীবনের দায় আরেফ আলীও বহন করেছে । সে অনাদরে একটা মানুষের মৃত্যু মেনে নিতে পারে নি । সে নিজের নৈতিকতাকে এড়িয়ে যেতে পারে নি । কাদের যখন তাকে সমস্ত ঘটনা ধামা চাপা দিতে বলে তখন সে নৈতিকতার আয়নায় নিজের কালিমা লিপ্ত মুখের চেহারাটাই দেখে । তাই সে তার চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় । কিন্তু এই নৈতিকতার সঙ্গে সার্ত্রিয় অস্তিত্ববাদের কোন যোগ নেই । সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের প্রধান শর্তই হল নিরীশ্বরবাদ । আঁতোয়া রকাঁত্যা ও নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু আরেফ আলী তা নয়। সে প্রথাগতভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী। আরেফ আলী নিজের কাছে সৎ থাকতে চেয়েছে কিন্তু রকাঁত্যা কোন পাপবোধে পীড়িত হয় নি। সে কষ্ট পেয়েছে নিজের পলায়নবাদী মনোভাবের জন্য । সমান্তরালে আরেফ আলী কিন্তু পালিয়ে যায় নি, সে ঝুঁকি সত্ত্বেও বিকৃত বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছে । আর সৃষ্টিতে প্রণত হবার জন্য রকাঁত্যা যে-বাধা উত্তরণ করেছে তা প্রকৃতই সাত্রীয় দেয়াল; তার সঙ্গে আরেফ আলীর দ্বিধার উত্তরণের কোন তুলনা চলে না । জাঁ পল সার্ত্র এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দু'জনেরই মানসগঠন ও চিন্তার মধ্যে আপাতভাবে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও উভয়ের ভেতরকার দুস্তর প্রভেদকেও অস্বীকার করা যায় না । আর প্রভাবের উপপাদ্যটি প্রতিষ্ঠা করার তো প্রশ্নই আসে না ।

সেখানে তার সরল ও নির্দোষ আনন্দের কথন, অনিচ্ছায় সংঘটিত অপরাধের বিচারের প্রহসন, দন্ড, পাপবোধহীনতা, জীবনাসক্তির আকুতি । ম্যর্সো ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, এমনকি বন্দি দশাতেও সে ঈশ্বরে আস্থা ব্যক্ত করে না । সে জীবনকে ভাবে মূল্যহীন । সে তার কৃতকর্মের দন্ড এড়াতে পারে না প্রচলিত মূল্যবোধে অঙ্গীকার না করার জন্য । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'চাঁদের অমাবস্যার'-আরেফ আলী ঈশ্বরবিশ্বাসী, নিরীহ এক গ্রাম্য যুবক । কিন্তু আপাতভাবে সাধারণ হয়েও সে নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে কাদের কৃত দন্ড জেনে বুঝে নিজের কাঁধে তুলে নেয় । সে যার অন্নে পালিত তারই বিরূদ্ধে সাক্ষ্য দেয় । অথচ ম্যর্সো যথেষ্ট স্বচ্ছল, সুখী, চিন্তাহীন, শেকড়হীন ফরাসি উপনিবেশ-উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়ার

মসীজীবী কেরাণি । তাই তার সঙ্গে চাঁদপাড়া গ্রামের আশ্রিত স্বল্প মাইনের স্কুলশিক্ষকের সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ উঠতে পারে না । সমাজে প্রচলিত সুনীতির প্রতি ম্যর্সোর আস্থা আনতে পারে না । অথচ যুবক শিক্ষক জীবনকে তাৎপর্যময় জ্ঞান করে, অনন্ত সম্ভাবনার উৎস বিবেচনা করে । বলা চলে কাম্যু যে অ্যাবসার্ড বা অর্থহীনতার দর্শন দিয়েছেন ওয়ালীউল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে তার চিহ্ন মাত্র নেই । তাই আমি বলতে পারি কাম্যুর রচনার মূলগত বক্তব্য ওয়ালীউল্লাহ্‌র তুলনায় ভিন্ন ও স্বতন্ত্র । 'চাঁদের অমাবস্যার' সঙ্গে যেমন 'দি আউটসাইডার' তেমনি 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় এসেছে কাম্যুর 'দি প্লেগ' উপন্যাসের কথা । কিন্তু কাম্যুর 'দি আউটসাইডার' উপন্যাসের সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যার' যতটুকুও বা সাদৃশ্য রয়েছে দুভার্গ্য বশত 'দি প্লেগ' উপন্যাসের সঙ্গে 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের ততটুকুও সাদৃশ্য নেই । কারণ 'দি প্লেগ' একটি মহামারীকে নিয়ে রচিত । সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনেই ইঁদুরকে হত্যা করা হয়েছে । আর 'কাঁদো নদী কাঁদো'-তে মুহাম্মদ মুস্তফার আত্মহত্যার কাহিনির সমান্তরালে এসেছে বাকাল নদীর বন্ধ্যাত্বের কথা । যেখানে এক অলৌকিক বিশ্বাসের বশীভূত হয়ে লোকে নদীতে নিজেদের মূল্যবান জিনিস-পত্র ছুড়তে থাকে, নিজেদের গবাদি পশু জবাই করে । এছাড়া কুমুরডাঙ্গার হাকিম মুহাম্মদ মুস্তফা এবং 'দি প্লেগ'-এর ওরান নগরীর ডাক্তার রিওকে মেলানো হয়েছে । কিন্তু দুজনেই সম্পূর্ণ আলাদা জগতের মানুষ । একজন যেখানে ন্যায়কে অন্যায় থেকে নিরাপদ করে অন্যজন সেখানে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে পারে নি নিজেরই কাছ থেকে। অন্যপক্ষে ডাক্তার রিও লড়াই করেছে মৃত্যুশাসিত জীবনের অসম্পূর্ণতা মোচনে ব্যক্তিমানুষের প্রয়াসের অর্থহীনতার বিরূদ্ধে । এই একক বিদ্রোহ থেকে সম্প্রদায়ের সম্পৃক্তির নিদর্শন 'কাঁদো নদী কাঁদো'-তে নেই ।

কাহিনিগত দিক দিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রতীচ্যের কোন লেখককে অনুকরণ না করলেও ভাষা রীতির ক্ষেত্রে তাঁকে প্রতীচ্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত হতে দেখা যায় । তিনি জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফের চেতনাপ্রবাহ রীতি বা 'স্ট্রীম আব কনসাসনেস' দ্বারা প্রাণিত হয়েছেন । তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস, এমনকি বহু ছোটগল্পও তিনি এই চেতনাপ্রবাহ রীতিতে রচনা করেছেন । যা সাধারণত কোন লেখকের ক্ষেত্রে দেখা যায় না ।তবে অবশ্যই তিনি তাঁর ভাষায় আলাদা মাত্রা যোগ করেছেন । জেমস জয়েস বা ভার্জিনিয়া উলফের চেতনাপ্রবাহ রীতি

ছাড়াও যোসেফ কনরাডের ন্যারেটিভিটির ছোঁয়াও ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় কখনও কখনও দেখা গেছে ।

আমাদের আলোচনার পরিশেষে আমরা একথা বলতেই পারি একজন শক্তিশালী লেখক আরেকজন লেখককে খুব সহজেই প্রভাবিত করতে পারেন অথবা কেউ একতরফাভাবে অন্যজন লেখককে তাঁর মেন্টর হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন । কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে তাঁর লেখায় সেই পূর্বসূরির হুবহু অনুকরণ পাওয়া যাবে । একজন সচেতন পাঠক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ও হয়ত কোনো লেখক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন । তাঁদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে বর্তমান তার সামান্য অস্তিত্ব যদি আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে পেয়েও থাকি তাতে দোষের কিছু নেই ।

তথ্যসূত্র :

১ মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ, ২০০০, বাংলাদেশ, পৃ-১০৫

২ ঐ, পৃ-১০৬

৩ ঐ, পৃ-৭৩

৪ ঐ, পৃ-৭৫

৫ ওয়ালীউল্লাহ্‌, অ্যান মারী - আমার স্বামী ওয়ালী, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, বাংলাদেশ, পৃ-৩৯

৬ ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - উপন্যাস সমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ১৯৯৬, বাংলাদেশ, পৃ-১৩৫

৭ ঐ, পৃ-১৪৫,

৮ ঐ, পৃ-৮৬

৯ মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ, ২০০০, পৃ-১০৮